শিক্ষাক্ষেত্রের স্খলন-পতন

দিল্লি বিমানবন্দরের ৩ নং টার্মিনালের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে এই বার্তালাপটি শুরু করব। যাঁরা বিদ্যাচর্চার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত নন অথচ শিক্ষা-কার্যক্রমের কর্তাব্যক্তি হওয়ার সুবাদে সেই কার্যক্রম কীভাবে চলবে তার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তাঁরা কী রকম আচরণ করেন তা বোঝাবার জন্য এই অভিজ্ঞতার গল্পটা শোনানো দরকার। সেদিন বিকেলে ত্রিবান্দ্রমগামী ফ্লাইটে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা নিয়েই আমার এই গল্প। আমি তখন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় ছিলাম। দেখি কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, দাদা আপনি আমাকে চিনতে পারেননি! আমি মার্জনা চেয়ে বললাম, এ আমার বয়সের দোষ। আমরা যখন কুশল বিনিময় করছিলাম, তখন তিনি যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সেই ভদ্রলোক একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এবং অবসর-পরবর্তী এই দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কিছু সৌভাগ্যবান অফিসারকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক হর্তাকর্তারা এমন দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। আইএএস অফিসারদের এইভাবে কেউ শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন: একদল আছেন যাঁরা চাকরিতে থাকার সুবাদে মানুষের আচরণ সম্পর্কে চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজেকে সমৃদ্ধ করার তাগিদে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এঁরা স্বীকার করতে সংকোচ করেন না যে তাঁদের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বের কারণে তাঁরা বিদ্যাচর্চার জন্য যথেষ্ট সময় পান না; এবং তাঁদের জ্ঞানচর্চা চরিতার্থ হতেও পারে না। তাঁরা এও স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন না যে "চাকরি-বাকরির দায়-দায়িত্বের পর এই প্রাপ্তিযোগের জন্য আপনাকে সৌভাগ্যবান হতে হবে এবং যতক্ষণ আপনি সরকারের সেই 'আশিসধন্য' কর্মকর্তাদের বন্ধনীতে থাকবেন ততক্ষণই তা পাবেন।" এঁদের মধ্যে এরকমও একদল আছেন যাঁরা 'ইস্পাত কাঠামোতুল্য' এই পেশার অন্তর্বর্তী থেকেও দুর্দান্ত কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে অবসর নিচ্ছেন।

২০২২ সালের নভেম্বরে আমার সেই ত্রিবান্দ্রম যাত্রার সময় আমি ওই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসারের সঙ্গে মোলাকাত করে বেশ হোঁচটই খেয়েছিলাম। আমার পরিচিত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গী খুব গর্বের সঙ্গেই তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তা। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগে কখনও দেখা হয়েছে কি না মনে নেই। তবুও তিনি প্রমাণ করতে চাইছিলেন আমি তাঁর পরিচিত। এর গল্পভাগ এইটুকুই। জানা গেল অবসরপ্রাপ্ত ওই আইএএস অফিসার সেই

সংস্থার প্রধান ছিলেন যা একটি অ্যাকাডেমিক জার্নাল প্রকাশ করত; এবং বিশ্বখ্যাত একটি প্রকাশনা প্রকাশিত ওই পিয়ার রিভিউড জার্নালের সূচনা পর্বে সম্পাদকীয় কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলাম আমিও। পরে আমি সরে আসি, কারণ ওই জার্নালের সম্পাদক সম্পাদকীয় দলের অন্য সদস্যদের মতামত বিবেচনার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই অনমনীয়। সেই সম্পাদক মনে করতেন, যেহেতু তিনি জার্নালের সম্পাদক, তাই তাঁর কথাই চূড়ান্ত এবং অন্য সহকর্মীদের কথা শুনতে তিনি প্রস্তুত নন একেবারেই। অন্যকথায়, জার্নালটা ছিল তাঁর নিজের জায়গিরদারির মতো, এবং তাঁর আচরণও ছিল তদ্রূপ। এরসঙ্গে পরে আমার কোনও সংযোগ ছিল না এবং জার্নালটিতে কী ছাপা হচ্ছে না-হচ্ছে তাও আর নিয়মিত দেখা হয়ে উঠত না। তবে এনিয়ে কোনও সংশয় নেই যে প্রকাশ করার জন্য মনোনীত প্রবন্ধগুলি তাদের উৎকর্ষের কারণে বেছে নেওয়া হত না; যে কারণে সেগুলো মনোনীত হত তা প্রকাশ্যে কহতব্য নয়। অবশ্য পিয়ার-রিভিউড জার্নালে নিরন্তর নিজেদের যুগোপযোগী করে রাখতে প্রযত্নশীল অনেক বিদ্বান মানুষ সংগঠনের উপযুক্ত ফোরামে এই সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন ইতিমধ্যেই। বিদ্যাচর্চাজনিত আমার উদ্বেগের কারণে; এবং বলা যায়, একটু বোকামির সঙ্গেই আমার এই উপলব্ধিটি সংগঠনের ওই শীর্ষকর্তার কাছে বলে বসেছিলাম, যিনি কিনা আমার মতোই উড়ে যাচ্ছিলেন ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে। এটা সম্ভবত আমার সম্পূর্ণ বোকামি ছিল যে আমি ভেবে দেখিনি আইএএস অফিসাররা; বিশেষ করে যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁরা কখনওই সমালোচনা ঠিকভাবে নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে। প্রকাশিত প্রবন্ধের মানের ক্রমাগত অধঃপতন সম্পর্কে আমার অকপট মতামত ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই বলে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করলেন যে তিনি কাউকে তাঁর জার্নালের অবমাননা করতে দেবেন না। অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য না হওয়া সত্ত্বেও গুণমান নির্বিশেষে এভাবেই যেন একজনের নিজের জিনিসের জন্য গর্ব বোধ করা উচিত! এটি একটি বিকৃত ও সংকীর্ণতাবাদী 'জাতীয়তা'র মতো যুক্তি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি গঠনমূলক সমালোচনা শোনার যোগ্য মানুষ তিনি নন। কথাবার্তা তেতে ওঠার আগেই আমি চুপ করে গেলাম, এবং 'আসুন আমরা ভিন্নমত প্রকাশ করার ব্যাপারে সহমত হই'-জাতীয় কিছু বলতে গেলাম না। যেন কিছুই ঘটেনি এমন একটা ভাব নিয়ে থাকলাম আমরা দুজনেই। তাঁর সঙ্গী, যিনি আমাকে চেনেন বলে দাবি করেছিলেন, তাঁর বসের সঙ্গে আমার বাক্য-বিনিময়ের সময় চুপ করে ছিলেন, কারণ সম্ভবত তিনি সেরকম থাকাই নিরাপদ কৌশল বলে মনে করেছিলেন।

উপরের গল্পটির একটি খুব নির্দিষ্ট অভিমুখ রয়েছে। একজন শিক্ষাবিদ এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষা-প্রশাসক হিসেবে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি আত্মসমীক্ষা ও অন্তর্দশন ছাড়া আমরা বুঝতে পারব না— কেন ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষার উচ্চ সোপানে আরোহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কেন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন!

আমাদের ভাবতে হবে, ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত চীন, কিংবা সিঙাপুরের মতো একটি নগর-রাষ্ট্রের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা কেন এত চোখে পড়ে; কেন সেসব জায়গার গবেষণা-প্রবন্ধ এত উচ্চাঙ্গের হয়? কীভাবে এটা সম্ভব হল— আর কেনই বা ভারতের অবস্থা দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু হল? কেন আমাদের মেধাবী ছেলেমেয়েরা দেশ ছেড়ে পশ্চিমে পাড়ি দিল? তারা আর দেশে ফিরে আসার কথাও ভাবে না। অবাক করার মতো ব্যাপার হল, এই ছেলেমেয়েরাই কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলিতে তাদের উচ্চমেধার পরিচয় দিয়ে চলেছে। আপাতভাবে এটাকে একটা ধাঁধা মনে হতে পারে; কিন্তু গভীর এবং নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েই হয়তো ভারতীয় বিদ্যাচর্চার মানের এই অবক্ষয়ের মূলের তত্ত্বতালাশ করা সম্ভব।

সমস্যার সূত্রপাত বোধহয় বিদ্যালয় পর্যায়ে বিষয়-নির্বাচনের পর্ব থেকে। সাধারণত যারা মাধ্যমিকে ভাল ফল করে তারা বিজ্ঞান শাখায় যায়। বাকিরা যায় অন্য শাখায়। সবসময় যে তারা পছন্দমতো বিষয়-নির্বাচন করতে পারে তা নয়, অনেকক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যত যেতে হয়, যেহেতু তারা বিজ্ঞান শাখায় পড়বার ছাড়পত্র পায় না। এইখানে আমরা একটি সতর্কবার্তা যোগ করতে চাই। অনেক মেধাবী ছেলেমেয়েও কিন্তু বিজ্ঞান না পড়ে তাদের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়! দ্বিতীয় সমস্যাটা উদ্ভূত হয় বিদ্যালয় পর্যায় থেকে উচ্চশিক্ষার ক্লাসরুমে প্রদত্ত শিক্ষার মানের কারণে। যদি আজকের শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত উচ্চমানের শিক্ষা না পায় তাহলে আগামী কাল তারা কী করে উত্তম শিক্ষক হবে? আমরা যদি শুধু ছাত্র আর শিক্ষকদের উপর দায় চাপিয়েই ক্ষান্ত হই তাহলে বলতে হয় আমরাও আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছি। আপৎকালে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে না থেকে সমস্যাটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করা দরকার।

একজন শিক্ষা-প্রশাসক হিসেবে এবং দেশের ও বিদেশের অনেক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন দশকের বেশি সময়ের শিক্ষক হিসেবে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভর করে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে চাই। একটি কারণ সহজেই হয়তো চিহ্নিত করা যায়— তা হল শিক্ষকতাকে যদৃচ্ছ পেশা হিসেবে গ্রহণ। অনেকদিন ধরেই আমরা দেখে চলেছি, অনেক স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে। শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্খলন-পতনের কথা যদি আমি অকপটে বলি তাহলে হয়তো আমাকে প্রাণে মেরে না ফেললেও একঘরে করে দেওয়া হবে। আমি সেই পরিণতি মেনে নিতেও প্রস্তুত, যেহেতু এখন আমি আমার জীবন ও কর্মজীবনের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছে গিয়েছি। সুতরাং পরিণতির কথা না ভেবে সেই তিক্ত সত্য কথাগুলো বলা কর্তব্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিকদের নিয়ত মাতব্বরি শিক্ষাকে রসাতলে পাঠিয়েছে। দেশের ভবিষ্যতে এর কী বিরূপ প্রভাব পড়বে তা নিয়ে তাদের কোনও হুঁশ নেই। এমনকি স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনয়নের প্রক্রিয়াও রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপমুক্ত নয়। আমি শুনেছি,—যদিও আমি ঠিক প্রমাণ দিতে পারব না;—এইসব পদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় রকমের টাকা-পয়সার কারবার চলে। ফলে কেউ যদি একবার এভাবে রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় নিয়োগ পায় তাহলে সেই নতুন নিয়োজিত ব্যক্তি হয় কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়, কিংবা চাকরি কেনার খরচটা উসুল করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অন্যভাবে বলা যায়, এরফলে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমস্যা বাড়তে থাকে। এই হচ্ছে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষকদের প্রতি সম্মানহীনতার কারণে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। একটা উপসর্গ প্রায়শই দেখা যাচ্ছে তা হল শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের বারবার অসৌজন্যমূলক আচরণ। উপাচার্য হিসেবে আমি নিজেও একাধিকবার এর শিকার হয়েছি। আমি আমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে এখানে সময় নষ্ট করব না, ইতিহাস তার বিচার করবে। ভারতের বেশিরভাগ ক্যাম্পাসেই এই অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। গবেষকরা যদি এই অবক্ষয়ের উৎস সন্ধানে নিয়োজিত হন; এবং তার প্রতিবিধান খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে সেটি শুধু তাঁদের কৃতিত্বের কাজ হবে তা-ই নয়, সেটা সমাজের কাজে আসবে। কাজটা খুব সহজ না হলেও খুব কঠিনও নয়।

এই অবক্ষয় রোধের জন্য ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাদের ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত মন্ত্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যদি নাও বলি তবু পরিচালিত তো হয়ই;—যাঁদের কিনা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তেমন কোনও অভিজ্ঞতাই নেই! এরফলে শিক্ষা-প্রশাসকদের সঙ্গে মন্ত্রী-আমলাদের সম্পর্ক নির্বিঘ্ন হতে পারে না; এবং শিক্ষা-বিষয়ে এই দুইপক্ষের ভাবনাচিন্তার অভিমুখ সবসময় মেলে না। যাঁরা স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনুগৃহীত' হয়ে পদলাভ করেন, তাঁরা রাজনীতিক নেতা, মন্ত্রী ও ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেন। পক্ষান্তরে, এইসব প্রতিষ্ঠানে ঘটনাচক্রে শিক্ষার প্রসারে উদ্যমী কোনও শীর্ষকর্তা নিযুক্ত হলে তাঁদের কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাঁরা উপরের দিক থেকে যেমন তেমনই সহযোগী শিক্ষকদের দ্বারা নিপীড়িত হন। সেইসব নিপীড়ক শিক্ষকেরা, তাঁদের যে প্রধান কর্তব্য— সেই শিক্ষাদানের ব্রত ভুলে গিয়ে ছাত্রদের অশিক্ষার পথে যেতে প্ররোচিত করে আমোদ পান। এই ধরনের শিক্ষা-প্রশাসকদের কাছে কালের স্রোতে গা-ভাসানো অন্য প্রশাসকদের মতো জীবন তত আনন্দময় থাকে না।

দুয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগত টেকনিক্যাল বক্তব্য এখানে বলা দরকার। আমাদের বিদ্যায়তনগুলি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যা একান্ত অবিচ্ছেদ্য,—সেই মূল্যবোধের শিক্ষা সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা ঠিক যে একজন ছাত্রের সুনাগরিক হয়ে ওঠার শিক্ষা পরিবার থেকে শৈশবেই অর্জন হয়ে থাকার কথা, কিন্তু যদি তা কোনও কারণে কার্যকরভাবে না হয়ে থাকে তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হল তার পরিপূরণ। আমি নিশ্চিত এবং আমরা সবাই এব্যাপারে সহমত হব যে আগেকার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সেই প্রীতিময় দিন আজ আর নেই। ফলে, শিক্ষকেরা আগেকার দিনের মতো আর সুনাগরিক ছাত্র তৈরি করতে প্রযত্নশীল হন না। সুতরাং, আমরা কী করে প্রত্যাশা করব যে আমাদের ছাত্ররা দেশের উত্তম নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সংবেদনশীল হবে?

দ্বিতীয় বক্তব্যটি হল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতো লোকরঞ্জনী অর্থদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না। নন-নেট ফেলোশিপ যদিও একটি ভাল লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটির অসদ্ব্যবহার হয়েছে। তথ্য ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে এর সাফল্যের হার প্রত্যাশাস্পর্শী হয়নি। নন-নেট ফেলোশিপ প্রাপকরা চারবছর এটি উপভোগ করে; এবং ইউজিসি-প্রদত্ত তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে অনেকেই তারপর গবেষণাছুট্ হয়ে যাচ্ছে, যা নীতি-পরিকল্পক এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অবশ্য একথাও বলতে হবে যে কিছু নন-নেট ফেলোশিপ প্রাপক নিশ্চয়ই অনন্যমনা গবেষক, এবং তারা খুব ভাল কাজের নমুনা রেখেও চলেছে।

এপিআই পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্যেও অনেক ফাঁক ও ফাঁকি রয়েছে। যেহেতু পদোন্নতির জন্য শিক্ষকদের এই এপিআই নম্বর জোগাড় করা প্রয়োজন, সেইজন্য তাঁদের মধ্যে একরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ইউজিসি কতকগুলি জার্নালের একটি তালিকা প্রণয়ন করে দিয়েছে যেগুলিতে লেখা প্রকাশিত হলে শিক্ষকেরা নম্বর পাবেন। আমি জানি না এটা খুব আন্দাজি বা ভুল কথা বলা হয়ে যাবে কি না যে, ইউজিসি তালিকাভুক্ত অনেক জার্নালই বিদ্যাচর্চার দিক থেকে আদৌ তেমন জুতের নয়। তবু এর একটা মূল্য এই যে বিদ্যাচর্চায় পরাঙ্মুখ অনেক শিক্ষককে এরফলে সামান্য হলেও অন্তত কিছু লিখতে ও তা প্রকাশ করতে বাধ্য করছে। যাই হোক, তবু এই ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয় তার কারণ: (ক) ইউজিসি তালিকাভুক্ত জার্নালগুলির মান একরকম নয়, যেহেতু এগুলির মনোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও কঠোর নিয়ম-নীতি অনুসৃত হয়নি। ফলে, অনেক জার্নালের তালিকা-অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সারবত্তা আছে। এবং (খ) অনেক অনলাইন জার্নাল মোটা টাকার বিনিময়ে শিক্ষকদের

লেখা ছেপে দেওয়ার কল পেতেছে তো বটেই, পদোন্নতি-প্রত্যাশী শিক্ষকদের হয়ে লিখে দেওয়ার অনেক ভুতুড়ে লেখকেরও আবির্ভাব ঘটেছে। দৃষ্টান্তের অন্ত নেই।

তৃতীয় বক্তব্যটি হল, মূল্যায়নের জন্য পিএইচ.ডি গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে সাম্প্রতিক নিয়মবিধির পরিবর্তন-সংক্রান্ত। আজকাল গবেষণায় কুম্ভীলকবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য আগাপাস্তালা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না যে সেই ব্যবস্থা সর্বত্র যথেষ্ট কঠোরভাবে পদ্ধতি মেনে হচ্ছে! ইউজিসি-র সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুসারে গবেষকদের পিয়ার-রিভিউড জার্নালে কমপক্ষে তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশের শর্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এর সঠিক কারণ আমার জানা নেই, তবে এটা পরিষ্কার যে এই প্রত্যাহার জাতীয় শিক্ষানীতি(২০২০)-র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্ভবত সংগতিপূর্ণ নয়।

পরিশেষে বলি, যে-বিষয়টা সবচেয়ে চিন্তার তা হল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বঘোষিত অভিভাবকেরা; যাঁরা শিক্ষার মূল সমস্যাগুলির প্রতিবিধান করার চেষ্টামাত্র না করে, এবং গবেষণাপত্র কমজোরি বাছাই-পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ জার্নালে প্রকাশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার ভবিষ্যতের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছেন। কারণ তাঁরা এই গবেষকদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন বিদ্যাচর্চার মানের চেয়ে বিদ্যা-বহির্ভূত অন্য কিছু চর্চার গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। আমি এখনও আশা রাখি যে দিল্লি বিমানবন্দরে সেই আইএএস অফিসারকে যা বলেছিলাম তা তাঁকে নিশ্চয় ভাবাবে যে, কীভাবে গবেষণাপত্রের মান দিন দিন শিক্ষাক্ষেত্রে মর্যাদা হারাচ্ছে। যদি আমি একজন বর্ষীয়ান আইএএস কার্যকর্তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়ে থাকি তাহলে বলতে হবে একজন শিক্ষক এবং গবেষক হিসেবে আমি আমার যথাকর্তব্য করতে পেরেছি। আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা বিদ্যার দেবী সরস্বতীর সেবক। শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে এই সেবাকার্যই আমাদের কর্তব্য। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে শিক্ষার সঙ্গে আমরা যাঁরা জড়িয়ে আছি, যে-শিক্ষকতা করছি, সেই শিক্ষকতা হল একমাত্র পেশা যেখানে মোটা বেতন দেওয়া হয় পড়াশোনার জন্যই। আমাদেরই বুঝতে হবে যে শিক্ষাকর্মকে গ্রহণ করতে হবে খুব গভীরভাবে, কারণ এরই উপর আমাদের দেশ ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আছে। সরস্বতীর আশীর্বাদ কখনও ভ্রষ্ট ও অলসদের উপর বর্ষিত হয় না, বরং তাঁর বরপ্রাপ্ত হন তাঁরাই যাঁরা সর্বাত্মকভাবে বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এবং যদি আমরা তেমন বরপ্রাপ্ত হতে পারি তাহলে বিশ্ব বা জগৎগুরু হওয়া আমাদের পক্ষে দূরগত স্বপ্ন বলে মনে হবে না। আর তা নইলে এ শুধু একটা ফাঁপা শ্লোগানে পর্যবসিত হবে।

ডিসেম্বর ২০২২

বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী
উপাচার্য, বিশ্বভারতী